অস্তগামী সূর্য

সুজিত সরকার

জীবনের শেষ কয়েকটি বছরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার মাংপুতে গিয়েছিলেন। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী মৈত্রেয়ী দেবী স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে দার্জিলিং থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে ছোট্ট এক গ্রামে থাকতেন। কালিম্পঙ্ থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে তিনি প্রথমবার এখানে আসেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পাহাড় অরণ্যে ঘেরা নির্জন মনোরম এই স্থানটি তাঁর পরিপূর্ণ মানসিক বিশ্রামের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হয়ে ওঠে। উপরন্তু, মৈত্রেয়ী দেবীর পরিবারের সেবাযত্ন ও ভালোবাসা তাঁকে জীবনের শেষ পর্বে বারবার এই অখ্যাত স্থানটিতে টেনে নিয়ে আসে। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও রোগক্লিষ্ট শরীরে তিনি এখানে এসে উপস্থিত হন সুদূর শান্তিনিকেতন থেকে, কখনো একমাস, কখনো আবার টানা দু'মাস কাটিয়ে যান। শেষবার এসেছিলেন ১৯৪০ সালের এপ্রিলে। ওই বছরই সেপ্টেম্বরে আবার কালিম্পঙ্ আসেন। সেখান থেকে মংপুতে আসতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু কালিম্পঙে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর আর মাংপুতে যাওয়া হয়নি। তবু, জীবনের শেষ দিনগুলিতে শান্তিনিকেতনে যখন প্রায় গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন, মংপুর স্মৃতিতেই ভ'রে থাকতো তাঁর মন। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' নামে মৈত্রেয়ী দেবীর একটি বই আছে। সেই বই পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিম পর্বের ছবিটি আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মংপুতে থাকাকালীন দুটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলে রবীন্দ্রনাথের কাছে দেখা করতে আসে এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। রবীন্দ্রনাথ 'Crescent Moon' ও 'Song offerings' থেকে তাদের প'ড়ে শোনান। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আমরা জানতে পেরেছি : 'যেখানে উনি (রবীন্দ্রনাথ) বসেছিলেন তার পেছনেই একটা তাকের উপর উজ্জ্বল আলো রেখে গিয়েছিল। রেশমের মত সাদা চুলের উপর সাদা আলো পড়েছে। সে সৌন্দর্য যে কি অপরূপ মানুষের ভাষা তা প্রকাশ করতে পারে না, চোখ তা দেখে তৃপ্ত হয় না। বাইরে তখন অরণ্যছায়ায় অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে চারিদিক ম্লান, শুধু আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোকে প্রকাশিত মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি, আর কানে আসে সুমধুর কণ্ঠস্বর। পড়া শেষ হয়ে গেলে আমরা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম, আর হৃদয়ের মধ্যে নীরবে ধ্বনিত হতে লাগল– 'In one salutation to Thee-In one salutation to Thee–একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।'

এই ছবির পাশাপাশি আমি আরো একটি ছবি রাখতে চাই ওই বইয়ের থেকেই। একটি ভোরবেলার ছবি। –'আজ মনে পড়ে তাঁর সেই ভোরবেলাকার শান্ত সমাহিত মূর্তি। দুটিহাত কোলের কাছে জড়ো করা, ভোর বেলার আলো গায়ে এসে পড়েছে। সামনের সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি। সেই সময় তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিশ্চয় অনুভব করেছেন, কতদূরের মানুষ তিনি। অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি খুকুর সঙ্গে ছড়া বলছেন আনন্দে কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, কত লিখেছেন, অথচ সহজ সরলভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, হাস্য-পরিহাস একটুও ব্যাহত হয়নি। সেই মহৎ অনন্য সাধারণ মন নিজেকে পৃথক করে সরিয়ে নিয়ে যায় নি। সকলের মধ্যে থেকেই যে সকলের উর্ধ্বে তিনি, সেই তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন।'

আশি বছর বয়সেও রবীন্দ্রনাথের শারীরিক সৌন্দর্য ম্লান হয়নি। তাঁর দীর্ঘ সুঠাম দেহ ও কোমল মসৃণ ত্বক যেন দেহকে অতিক্রম ক'রে দেহাতীতে কিছুকে প্রকাশ করছে। তিনি অনুভব করেছিলেন : 'তাঁর শরীরগত লাবণ্য যেন লৌকিক থেকে অলৌকিকের দিকে– দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে চলেছে।' এমনকি কালিম্পঙে যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং যার ফলে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সাহেব ডাক্তার তাঁর বুকের কাপড় সরিয়ে পরীক্ষা ক'রে, পায়ের ফোলা অনুভব ক'রে, নাড়ী ধরে পরীক্ষা ক'রে বিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন 'What a worderful body !'

কলকাতায় তাঁকে নিয়ে আসার পরে প্রায় মাসখানেক শয্যাশায়ী থেকে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯৪১ সালে ৭জানুযারী শান্তিনিকেতন থেকে তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে একটি চিঠি লেখেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত হল:

কল্যাণীয়াসু,

কাল তোমাকে হতাশ্বাস ভাবে চিঠি লিখেছি, আজ বৌমার কাছ থেকে যথাসম্ভব খবর পেয়েছি– অতএব সে চিঠি ক্যানসেল্‌ড্। তোমারও অনেক খবর পাওয়া গেল। সব কথা আলোচনা করবার মত শক্তি নেই। অতএব চুপ করলুম। আমার ভ্রমণ এক ঘর থেকে আর এক ঘরে এবং ঘর থেকে বারান্দায়! সারাদিন কেদারটাতে বসে তোমাদের সচলতাকে ঈর্ষা করি।

বড় ঘর থেকে এসেছি কাঁচের ঘরে। বসে আছি নির্জনে, জানালার ভিতর দিয়ে আলো আসছে– দুর্দিনগ্রস্ত রোগীর পক্ষে সে একটা পরম লাভ, জীবনের মহাদেশ থেকে আমাকে দ্বীপান্তরে চালান করা হয়েছে–একলা ঘোর একলা। চললুম, সেলাম। ইতি–

৭/১/৪১ তোমাদের নির্বাসিত

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যেন বুঝতে পারছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে। তাঁর শেষ দিকের লেখায়, বিশেষত কবিতায়, এই বিদায়ের সুর ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট মারা গেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪০-এর ৭ আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি. লিট. প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি শান্তিনিকেতনেই হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের' 'রবীন্দ্রজীবনকথা' থেকে জানা যায় যে এসময়ে রবীন্দ্রনাথের হাঁটাচলা করতেও কষ্ট হচ্ছিল, ঠেলাগাড়িতে চেপেই তাঁকে চলাফেলা করতে হচ্ছিল, চোখের দৃষ্টিও কমে এসেছিল, কানেও কম শুনছিলেন। এর মধ্যেই লিখেছেন 'ল্যাবরেটরি' গল্প। কখনো কেদারায় ব'সে আবার কখনো বিছানায় শুয়ে দিন

কাটছিল তাঁর। রাতেও ঘুম হ'ত না ভালোভাবে। এইরকম অবস্থায় লেখা তাঁর একটি কবিতা এবার প'ড়ে নেওয়া যাক:

একা ব'সে সংসারের প্রান্ত-জানালায়
দিগন্তের নীলিমায় চোখে পড়ে অন্তরের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত
শিরীষের গাছ হতে শ্যামলের স্নিগ্ধ সখ্য বহি।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দুর।
পথ রেখা লীন হল অস্তগিরিশিখর আড়ালে,
স্তব্ধ আমি দিনান্তের পান্থশালাদ্বারে,
দূরে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ -মন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।
বাজে মনে— নহে দূর, নহে বহু দূর।।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ মারা যান রবীন্দ্রনাথ। পরের মাসেই 'বিশ্বভারতী' থেকে প্রকাশিত হয় 'শেষ লেখা'। পনেরোটি কবিতার সংকলন। এই গ্রন্থে শুরুতেই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, অন্তর্গত কবিতাগুলি কয়েকটি তাঁর পিতা নিজের হাতেই লিখেছেন, কয়েকটি শয্যাশায়ী অবস্থায় মুখে মুখে বলেছেন এবং তাঁর কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ লিখে নিয়েছেন, পরে সেগুলি দেখে সংশোধন ক'রে মুদ্রণের অনুমতি দিয়েছেন। গ্রন্থের শেষ কবিতাটি অর্থাৎ 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' তিনি সশোধন করার সুযোগ পান নি। ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই ডাক্তারদের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের জন্য রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনা হয়। রচনার তারিখ দেখে আমরা বুঝতে পারি, শেষ তিনটি কবিতা রচিত হয় কলকাতার জোড়াসাঁকোতেই— 'প্রথম দিনের সূর্য' ২৭ জুলাই, 'দুঃখের আঁধার রাত্রি' ২৯ জুলাই এবং যেদিন অস্ত্রোপচার হয় অর্থাৎ ৩০ জুলাই, সেদিনও একটি কবিতা রচিত হয়েছিল সকাল সাড়ে নটায়, অস্ত্রোপ্রচারের কিছু আগেই— 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ অকীর্ণ করি' —এটাই তাঁর অসংশোধিত শেষ লেখা। এর সাতদিন পরেই তিনি মারা যান।

৯ শ্রাবণ শেষবারের মতো শান্তিনিকেতন ছেড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৈশাখে অর্থাৎ কয়েকমাস আগেই বুদ্ধদেব বসু সপরিবারের শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। যদিও অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথের ঘাড় বেয়ে নেমে আসা চুল কেটে ফেলা হয়েছে, তবুও বুদ্ধদেব বসু তাঁকে দেখে অশীতিপর টলস্টয়ের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন, কী সুন্দরভাবেই না তিনি বলেছিলেন 'এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখভোগের প্রয়োজন ছিলো।' সকলেই জানেন, বুদ্ধদেব বসু ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান স্থপতি। উপরন্তু, মহৎ এক গদ্যশিল্পী। কবিত্বের ছোঁয়া লেগে তাঁর গদ্যও হয়ে উঠেছে অনুপমেয়। 'রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন' পড়ার পরে মনে হয় অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ এত সুন্দরভাবে আর কোথাও চিত্রিত হন নি শান্তিনিকেতনে যাবার সময়ে একদিন ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে বুদ্ধদেব বসু কয়েকটি প্রশ্ন লিখে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আশা করেছিলেন এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ মুখে হয়তো কিছু বলবেন। কিন্তু পরের দিন সকালে তাঁর কাছে যেতেই তিনি ব'লে উঠলেন : 'কী কতগুলো বর-ঠকানো প্রশ্ন করেছো! এই নাও। '—রাণী চন্দ হস্তলিখিত প্রবন্ধ বুদ্ধদেব বসুর হাতে তুলে দিলেন। অবাক হয়ে বুদ্ধদেব বসু মনে মনে ভেবেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঘুম ভাঙার পর শুরু করেছিলেন এবং বুদ্ধদেব বসুর ঘুম ভাঙার আগে শেষ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, ওটা যথেষ্ট হয়নি মনে ক'রে দু'দিন পরে ওর সঙ্গে আর -একটি ছোট প্রবন্ধ জুড়ে দেন। বুদ্ধদেব বসু আসার আগে শান্তিনিকেতনে শেষ পাঁচটি বৈশাখ অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জন্মদিনের কবিতা লিখে পাঠান বাঁকুড়ায় অন্নদাশংকর রায়কে। কবিতাটি 'শেষ লেখা'র অন্তর্গত। প্রথম ছ'টি পংক্তি উদ্ধত হ'ল:

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা,
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

এরই কিছুদিন পরে ত্রিপুরার রাজদরবার থেকে প্রতিনিধিরা এসে রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি প্রদান করেন।

এবার 'শেষ লেখা'র চতুর্থ ও পঞ্চম কবিতার কিছু লাইন এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে, তারপর কবিতা দুটির পিছনে যে একটি মধুর কাহিনী রয়ে

গেছে তার কথা বলা হবে। প্রথমে চতুর্থ কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন:

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি।
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।
বুক ভরা তার
হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার।

এরপর দু'স্তবকে রচিত পঞ্চম কবিতাটি শেষ দুটি স্তবক:

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা,
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহারি বারতা।

১৯২৪ সালে আমন্ত্রিত হয়ে পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে ডাক্তাররা তাঁকে কোনো গ্রামাঞ্চলে কিছুদন বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন। রবীন্দ্রনাথ তখন আর্জেন্টিনায়। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ব্যবস্থাপনায় তিনি সান ইসিদ্রোয় এক পল্লীনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবি, লেখিকা ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো আর্জেন্টিয়ায় সুপরিচিত ছিলেন। এই সেই নারী যাঁর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী, মাধুর্যসুধায়'। 'পূরবী'র 'অতিথি' কবিতার পাশাপাশি 'শেষ বসন্ত' কবিতাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন; 'বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই/ এতকাল ভুলে ছিনু তাই।/ হঠাৎ তোমার চোখে/ দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে/ আমার সময় আর নাই।' সান ইসিদ্রোয় যে চেয়ারটিতে রবীন্দ্রনাথ বসতেন, রবীন্দ্রনাথের বিদায় নেবার মুহূর্তে সেই চেয়ারটি তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্য জাহাজের যে দুটি কেবিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার একটিতে তুলে দিতে চাইলেন। জাহাজ কোম্পানির কর্তারা প্রথমে রাজি হ'তে চাননি, কিন্তু ওকাম্পো কবজ খুলিয়ে কেবিনের দরজা সরিয়ে চেয়ারটিকে যথাস্থানে বসাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই চেয়ার নানা দেশ ঘুরে অবশেষে শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছিল। জীবনের অন্তিম পর্বে ওই চেয়ারটিতেই রোগক্লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ব'সে ব'সে বিশ্রাম নিতেন। ওই চেয়ারটির কথাই ফিরে এসেছে উল্লিখিত কবিতা দুটিতে। বোঝা যায়, মংপুর স্মৃতিই শুধু নয়, সান ইসিদ্রোর মধুর স্মৃতিও মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছিল। 'শেষলেখা'র যে দুটি কবিতা সর্বাধিক পরিচিত সে দুটি হ'ল 'প্রথম দিনের সূর্য' ও 'তোমার সৃষ্টির পথ'। এই দুটি কবিতার দুটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। 'প্রথম দিনের সূর্য 'কবিতাটি এগারো - লাইনের একবার এখানে স্মরণ করা যাক:

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি–
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়–
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

শঙ্খ ঘোষ কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন : 'হিমেনেথ যাকে বলেন নগ্ন কবিতার সাধনা সেই রকম দিব্য এবং মুক্ত এবং নগ্ন এক কবিতাশরীর ঝলমল করে উঠল এখানে।' মনে আছে, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি ও 'নবজাতক'-এর 'প্রশ্ন' কবিতাটির যে দুটি আলোচনা করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ তা নিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে। দুটি বিশিষ্ট কাব্য-আলোচকের এমন শিক্ষিত ও মার্জিত তর্কাতর্কি বাংলা কবিতার আলোচনা ইতিহাসে আর কোথাও নেই। মজার ব্যাপার, শঙ্খ ঘোষের আলোচনাটি পড়ে মনে হয়, উনিই ঠিক কথাটি বলেছেন, আবার আবু সয়ীদ আইয়ুব যখন পাল্টা যুক্তি দেখান তখন সেটাও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। 'তোমার সৃষ্টির পথ' রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা, অস্ত্রোপচারের

কিছু আগে। ‘কবিতাটির কয়েকটি লাইন:

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবিতাটির অর্থ করেন এভাবে : ‘প্রকৃতি (নিয়তি, বিশ্ব বা বিশ্বপ্রকৃতি) তার সৃষ্টির প্রতিটি বাঁকে সুকৌশলে পৌরুষনাশী ছলাকলার জাল বিছিয়ে রেখেছে। সরলচেতা পুরুষকেও সে বিপর্যস্ত করতে চায় মায়াবী মুখোশ পরে। কিন্তু সরলচেতা পুরুষ সেই অন্ধকারে পটেই নিজের মহত্ত্বকে স্পষ্ট ক’রে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর ব্যক্তিগত সাধ-স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে। ছলনাময়ী বা প্রকৃতি তাঁকে যে আলোক বা পথনির্দেশ দিচ্ছে ব’লে মনে হচ্ছে তা আসলে কবির নিজের কাছ থেকেই পাওয়া’।

বিশিষ্ট কবি ও অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে জীবনের এই সর্বশেষ রচনাটিতে ‘মিথ্যা বিশ্বাস’ সে সার্ত্রর Bad Faith -এর আক্ষরিক অনুবাদ। ‘প্রথম দিনের সূর্য, সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: ‘কল্পিত দেবতা বা স্বর্গের দিকে প্রশ্ন না ছুঁড়ে আপন অস্তিত্বের ওপরই তিনি জিজ্ঞাসার চিহ্নটি বসিয়ে দিয়েছেন। উত্তর মিলুক বা নাই মিলুক চৈতন্যের স্বরূপ কি, সেটাই তাঁর জিজ্ঞাসা হয়ে উঠেছে।’ আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বের কবিতায় সেই ‘সুন্দর’কে প্রণাম জানিয়েছিলেন– ‘নিষ্ঠুর’ ও ‘ভয়ানক’ও যার অভিধাভুক্ত’। আরো, বলেছেন ‘ভয়ানক ও সুন্দরকে এমন দেখতে পাওয়া তাঁর জীবনের ‘শেষ পুরস্কার’। তিনি দেখিয়েছেন যে শেষ জীবনে মহাযুদ্ধ, খন্ডযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, ‘মনুষ্য জাতির পৌনঃপুনিক মূঢ় আত্মজিঘাংসা’ই রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছে এবং এর সঙ্গে মিশে আছে ‘সমস্ত সৌরজগৎ এবং যাবতীয় নক্ষত্রলোকের অবধারিত ‘তাপমৃত্যু’র বিভীষিকা’। আবু সয়ীদ আইয়ুব শেষ পর্বের যে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, সেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনে নিতে পারি তাঁরই ‘শেষ লেখা’র অন্তর্গত একটি কবিতা থেকে যা রচিত হয়েছিল ১৯৪১ সালের মে মাসে, শান্তিনিকেতনে, যার কয়েকটি লাইন : ‘সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা।’ সেই মে মাসেই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিদায় নেবার মুহূর্তে বুদ্ধদেব বসুর মনের অবস্থা কী হয়েছিল তা জানিয়েই এই লেখা শেষ করছি:

‘চ’লো আসার দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম রোগশয্যায়। ভাবিনি এমন দৃশ্য দেখতে হবে। বাইরে বিকেলে উজ্জ্বলতা থেকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে চমকে গেলুম। অন্ধকার; এক কোণে টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত ইজিচেয়ারে অনেকগুলো বালিশে হেলান দিয়ে কবি চোখ বুজে চুপ। ঘরে আছেন ডাক্তার, আছেন সুধাকান্ত বাবু। আমরা যেতে একটু চোখ মেললেন, অতি ক্ষীণস্বরে দু-একটি কথা বললেন, তাঁর দক্ষিণ কর আমাদের মাথার উপর ঈষৎ উত্তোলিত হয়েই নেমে গেলো। হঠাৎ আঘাত লাগলো হৃদ্‌যন্ত্রে, গলা আটকে এলো, কেমন একটা বিহ্বলতায় তাঁর দিকে ভালো ক’রে তাকাতেও যেন পারলুম না। বাইরে এসে নিশ্বাস পড়লো সহজে। অমর কবি এই উজ্জ্বল আলোর চিরসঙ্গী, রুদ্ধ ঘরে বন্দী হ’য়ে আছে ভঙ্কুর মৃৎপাত্র।’